নাম: আবদুল্লাহ সিদ্দিক

জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি, ২০০৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান: পপুলার হাসপাতাল সংলগ্ন, ঝিগাতলা, ঢাকা

শহীদের জীবনী

আবদুল্লাহ সিদ্দিক, নামটি শুনলে প্রথমে মনে হতে পারে, আরেকটি সাধারণ নাম।কিন্তু একটু তাকালেই বোঝা যায়, এ নামের ভেতর ঢুকে আছে হাজারো তরুণের মুখ, একটাই চেহারা,একটাই আগুনে মুখাবয়ব, যে প্রতিবাদ করে, ভালোবাসে, হার মানে না।জন্ম হয় ২০০৩ সালে, এমন এক সময়ে যখন বাংলাদেশের আকাশে সোনালি স্বপ্ন নয়, বরং ঝুলছিল দুঃস্বপ্নের মেঘ।রাজনীতির বুক জুড়ে তখন কেবল হিংসা আর হীনতা, আর অর্থনীতির রাস্তায় রোজ পাথর ছুঁড়ে মারছে বেকারত্ব, দুর্নীতি আর দারিদ্য যে সন্তানের মৃত্যুতেও একজন পিতা মাথা নোয়ায়নি

এই অস্থির সময়েই ঢাকার ধোলাইঘাটে বড় হয়ে ওঠেন আবদুল্লাহ।তিনি ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের মার্কেটিং বিভাগের এক প্রতিভাবান ছাত্র।কিন্তু শুধু ছাত্র বললে ভুল হবে।দিনের আলোয় তিনি পড়তেন, রাতের আঁধারে ব্যবসা চালাতেন,গাড়ির পার্টসের দোকানে নিজ হাতে হিসাব রাখতেন, ক্রেতার মুখ পড়ে বুঝতেন কে প্রকৃত দরিদ্র, কে লোভী ব্যবসায়ী।এ ছিল তাঁর জীবন, আর সেই জীবনই হয়ে উঠেছিল পরিবারের ভরসা।তাঁর বাবা একদিন বলেছিলেন, "আমি অবসরে, কিন্তু আবদুল্লাহই আমার জীবন চালাত।' সেই কথায় শুধু অর্থনৈতিক নির্ভরতার গল্প নেই, আছে এক পিতা-পুত্রের যুগল সংগ্রামের ইতিহাস,যারা একসঙ্গে বাজারে যান, একসঙ্গে লেনদেনের খাতা মেলেন, আবার রাতের খাবারে জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন।এ যেন পরিবারের ভেতর এক ছোট্ট মুক্তিযুদ্ধ,আর্থিক দৈন্যতার বিরুদ্ধে, আর প্রতারণার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক অনবদ্য লড়াই।ছোটবেলা থেকেই আবদুল্লাহর মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতার প্রতি ঝোঁক। খেলাধুলা, পড়ালেখা, ব্যবসা,যেখানে পা রেখেছেন, সেখানেই রেখে গেছেন স্পর্শ।তবুও, বাবার অনুরোধে একদিন প্রতিযোগিতা ছেড়ে বসেন বইয়ের পাশে। শুরু হয় তাঁর স্বপ্ন দেখার আরেক অধ্যায়,একটি এমন দেশ, যেখানে পিতা অবসরে গিয়ে অনাহারে কাঁদবেন না, যেখানে সন্তান প্রতিদিন আতঙ্ক নিয়ে বাসা থেকে বের হবে না।আবদুল্লাহ মাসে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতেন, এ যুগে একজন তরুণের জন্য এটা কম নয়।কিন্তু তিনি ছিলেন লোভশূন্য।"একটি স্বাধীন দেশের চেয়ে বড় সম্পদ নেই",এই কথাটা ছিল তাঁর বুকের মন্ত্র।তিনি জানতেন, যতোই উপার্জন হোক, যতই জমি-জমা হোক, যদি বিচার না থাকে, নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সবই ব্যর্থ।তাঁর চোখে সফলতা ছিল রুটির দোকানে না, বরং দেশের ভাগ্যাকাশে।

এমন একজন তরুণ,যিনি এক হাতে সংসার সামলান, অন্য হাতে জাতির ব্যানার তোলেন,তিনি কি কেবল এক ছেলের পরিচয় হতে পারেন? না, তিনি হয়ে উঠেছেন সেই সেতু, যার ওপর দিয়ে হেঁটে যায় আমাদের আশা, আমাদের নির্ভীকতা, আমাদের 'জুলাই বিপ্লব'।তিনি শুধু পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন না, ছিলেন সময়ের সন্তান, ইতিহাসের যোদ্ধা, আর এই যুগের প্রতিটি তরুণের প্রতিচ্ছবি।

আবদুল্লাহ নেই।কিন্তু তাঁকে যারা চিনেছে, তারা আজও বুকের মধ্যে ঝড় বয়ে নিয়ে হাঁটে,কারণ এমন মানুষ হারিয়ে গেলে, বেঁচে থাকাটাও হয়ে যায় এক রকমের ঋণ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: জুলাইয়ের আগুনজ্বলা বিবৃতি

২০২৪ সালের জুলাই,বাংলাদেশ যেন ইতিহাসের অনুত্তরিত এক প্রশ্নে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দেশ।আকাশ নীল ছিল না, বাতাসে স্বস্তি ছিল না, মানুষের কণ্ঠে হাসি ছিল না,সবকিছু যেন প্রস্তুত ছিল এক মহা বিস্ফোরণের জন্য।পনেরো বছরের স্বৈরাচারী শাসন, যেটি একদিন গায়ে গায়ে একদলীয় রাষ্ট্রের বিষ মেখে নিয়েছিল, সেই শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় একটি প্রজন্ম।কোটা সংস্কার আন্দোলন,এ যেন কেবল একটা দাবি নয়, এক রক্তমাখা ধ্বংসাত্মক চিৎকার, যেখানে প্রতিটি কণ্ঠে ছিল অতীতের ক্ষোভ, বর্তমানের যন্ত্রণার কান্না আর ভবিষ্যতের আশাহীন প্রতিজ্ঞা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, একদলীয় নির্বাচনের ধোঁয়াশা পেরিয়ে ফের রাষ্ট্রযন্ত্র কব্জা করলেন, আর তার সাথেই ফিরে এল সেই প্রাচীন, বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা।যেন ২০১৮ সালের ছাত্রদের বিজয় কোনো মূল্যই রাখে না, যেন তরুণদের ঘাম ঝরানো আশা কেবল বালুর ওপর লিখা নাম।১ জুলাই শুরু হয় শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ,অহিংসা, প্ল্যাকার্ড, পোস্টার আর পদচারণায় ভরে ওঠে ক্যাম্পাস থেকে রাজপথ।কিন্তু কোনো স্বৈরতন্ত্র কখনো প্ল্যাকার্ডে থেমে থাকে না। ১৫ জুলাই,বাংলার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত।আবু সাঈদের নিথর দেহ পড়ে থাকে রাজপথে, আর সেই রক্ত ভেদ করেই সারা দেশের ছাত্র, শ্রমজীবী, বেকার, পথচারী সবাই যেন ঘুম ভেঙে একসাথে গর্জে ওঠে।ঢাকার ইটপাথর, রংপুরের ধুলোবালি, নারায়ণগঞ্জের শ্রমঘামে একসাথে মিশে যায় এই বিদ্রোহে।এই আন্দোলনের ছিল না কোনো নির্ধারিত নেতা, ছিল না দল বা মঞ্চ,ছিল শুধু একটি ডাক, যেটি যেন বুক চিরে বেরিয়ে আসে: “অবসান করো স্বৈরাচার!”

এই আহ্বানটি আবদুল্লাহ শুনেছিলেন গোপন কোনো চিঠির মতো,একান্ত, ব্যক্তিগত, আর তীব্র।তিনি কেবল হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্র ছিলেন না, কেবল গাড়ির যন্ত্রাংশ বিক্রেতা ছিলেন না,তিনি ছিলেন এই সময়ের বিবেক।যখন একটি প্রজন্ম প্রশ্ন করছিল, “আমাদের জীবনের মানে কী?”, তখন আবদুল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন নিজের চলনে, বলনে, এবং আত্মদানে।“যদি দেশ স্বাধীন না হয়, যদি ফ্যাসিবাদকে ঠেকানো না যায়, তবে সব আয়, সব ডিগ্রি, সব স্বপ্ন মূল্যহীন”,এ ছিল তাঁর বিশ্বাস।আর সে বিশ্বাসের খাতিরেই তিনি ক্লাসরুম ফেলে, ব্যবসার খাতা গুটিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন।হাতে অস্ত্র ছিল না, কাঁধে রাইফেল ছিল না,ছিল কেবল হৃদয়ে বিদ্রোহ আর কণ্ঠে স্বাধীনতার হাহাকার।তিনি জানতেন, মৃত্যুর দুঃসাহস নিয়ে চলা মানুষেরা ইতিহাস লেখে।

আবদুল্লাহ নামেননি শুধু নিজের জন্য।তিনি নামেননি শুধু পরিবারের সম্মান রক্ষায়।তিনি নেমেছিলেন আমাদের জন্য,আমার জন্য, তোমার জন্য, সেই ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখনো জন্ম নেয়নি।তিনি ছিলেন না আন্দোলনের পোস্টারে, কিন্তু তাঁর পদচারণা ছিল সে বিপ্লবের ছায়ায়।আর তাই আজ তাঁর মৃত্যু নয়, তাঁর অংশগ্রহণ,তাঁর নাম উচ্চারণ,তাঁর শহীদ হওয়াই হয়ে দাঁড়ায় জুলাই বিপ্লবের শপথনামা।

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

এই বিপ্লব চলবে,কারণ কেউ একজন জীবন দিয়ে বলেছে, “স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই অর্থপূর্ণ নয়।”

যেভাবে শহীদ হন: আগুনের ভিতর দিয়ে একটি নাম পুড়ে হয়ে ওঠে প্রতীক।আবদুল্লাহ শহীদ হন ঢাকার জ্বলন্ত রাজপথে, সেখানেই যেখানে ইতিহাস বারবার রক্ত চেয়েছে।গুলির শব্দ, শ্লোগানের গর্জন আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো কাঁদুনির গন্ধে একদিন শহরটা ধিকি ধিকি পুড়ছিল,আর সেই আগুনেই মিশে গেল এক তরুণের স্বপ্ন, নাম: আবদুল্লাহ।

তিনি গুলি খেয়ে পড়েননি, তিনি হোঁচট খেয়ে মরেননি।তাঁকে মারার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল, নিখুঁতভাবে, শিকারির মতো।কোনো হঠাৎ সংঘর্ষ নয়, কোনো ভুল বোঝাবুঝি নয়,এ ছিল পরিকল্পিত হত্যা, রাষ্ট্রপ্রণীত নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক প্রতিশোধের সুনিপুণ শিকার।ছাত্রলীগ নামক শাসকদলের রক্তপিপাসু বাহিনী তাঁকে আলাদা করে টার্গেট করেছিল,তাঁর সংগঠকসুলভ ভূমিকার জন্য, তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য।

আবদুল্লাহ ছিলেন না অস্ত্রধারী, ছিলেন না কোনো বিপ্লবী দলের চাঁদা সংগ্রাহক।তিনি ছিলেন এক তরুণ, যার হাতে ছিল ব্যানার, যাঁর পকেটে ছিল প্ল্যাস্টিকের বোতলে পানি, কিছু ওষুধ, আর একটা ফোন,যার মাধ্যমে তিনি ছড়িয়ে দিতেন আন্দোলনের বার্তা।পিতা বলেন, “হাসিনা আমার কলিজা নিয়ে গেছে।”

এ বাক্য শুধু এক সন্তানের শোকে ভেঙে পড়া কোনো বাবার বিলাপ নয়,এ এক রাষ্ট্রবিরোধী স্বীকারোক্তি, যাকে ইতিহাস কখনো উপেক্ষা করতে পারবে না।এই কণ্ঠস্বর ফুঁড়ে উঠে আসে শত সহস্র পিতার আর্তনাদ, যারা তাঁদের সন্তানদের পাঠিয়েছিল শিক্ষা নিতে, কিন্তু ফিরিয়ে পেয়েছে লাশ,পেট কাপড়ে মোড়ানো, চোখ বন্ধ, কপালে বিদ্রোহের দাগ।

আবদুল্লাহ ১৯ জুলাইয়ের দিকে সরব উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনে।ব্যানার তৈরি, স্লোগান লেখা, খাবার জোগাড়, চিকিৎসাসেবা,সবখানে ছিলেন সে।বন্ধুদের বলতেন, “আমরা যদি না দাঁড়াই, তাহলে আর কারা দাঁড়াবে?”

এই এক লাইনেই তার আদর্শের গভীরতা স্পষ্ট।তিনি ছাত্র ছিলেন, ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল তিনি একজন সচেতন নাগরিক, যিনি জানতেন, একটা দেশের মেরুদণ্ড হয় মানুষের নৈতিক সাহস দিয়ে।

যখন তাঁর ওপর হামলা হলো, তখন আশপাশের সবাই বলেছে, “ওকে আলাদা করে মেরেছে”,এই আলাদা করাটা আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে ভীতিকর সত্য।সচেতনতা এখানে অপরাধ, আদর্শ সেখানে মৃত্যুদণ্ড।তাঁর শরীরের আঘাতগুলো বলেছে, "তুমি কেন ভাবলে যে তোমার কোনো অধিকার আছে?" হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।হৃদপিণ্ড থেমে যায়, কিন্তু আদর্শ থেমে যায় না।তিনি মারা যান না, বরং তিনি চিরস্থায়ী হন,একটি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার প্রতীক হয়ে।তাঁর ছবি পোস্টারে ছিল না, তাঁর নাম কোনো সংগঠনের ঘোষণাপত্রে ছিল না,তবু, তাঁর রক্তে লেখা হয় এক নতুন পঙ্‌ক্তি: “সচেতন হওয়া মানেই শহীদ হওয়ার প্রস্তুতি।”

আবদুল্লাহ সেই নাম, যাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল রাষ্ট্র, অথচ সেই নামই হয়ে গেল এক নতুন বিপ্লবের প্রস্তাবনা।এখন যখন কেউ বলে “স্বাধীনতা”, তখন আবদুল্লাহর রক্ত সেই শব্দে ঢেউ তোলে।আর আমরা জানি,যতদিন এই দেশের আকাশে অন্যায়ের ধোঁয়া, ততদিন আবদুল্লাহর মতো শহীদরা আগুন হয়ে ফিরবেন।

পরিবারের বক্তব্য ও শোকের ভাষা

একটি হৃদয়ের ভাঙা দরজার ভেতর থেকে শোনা যায় দেশের কান্না।আবদুল্লাহর পিতা বলেছিলেন, “আমার ছেলেকে যদি এক হাতে দিত, আর অন্য হাতে যদি গোটা পৃথিবী থাকত, আমি ছেলেকেই নিতাম।”

এই একটি বাক্য যেন সময়কে থামিয়ে দেয়।সে বাক্যে নেই কোনো অহেতুক নাটক, নেই কান্নার অযথা আবেগ।আছে শুধু একটি অসহায় হৃদয়ের চিৎকার, যা রাষ্ট্র শুনতে চায় না, আর সমাজ শুনেও চুপ করে থাকে।

এই পিতার নাম ইতিহাস ভুলে যাবে না।কারণ তিনি শুধু সন্তান হারাননি, তিনি দেশকে দিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ।আবদুল্লাহর মৃত্যুতে এক পরিবার নয়, এক প্রজন্ম অনাথ হয়ে গেছে।বাবা বলেন, “সে দেশের গর্ব, সে গেছে, কিন্তু আমার দুঃখ নেই,স্বাধীনতা দিয়ে গেছে।”

এই বাক্যে যে আত্মত্যাগ লুকিয়ে আছে, তা কোনো রাজনৈতিক স্লোগানে মাপা যায় না।এটা সেই স্তব্ধ আত্মসমর্পণ, যেখানে একজন পিতা জানেন,তাঁর সন্তান আর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটবে না, ঘরে ফিরে চা খাবে না, ব্যবসার হিসাব দেখবে না, আর কোনো দিন বলবে না, “আব্বু, একটু বিশ্রাম নেন, আমি সামলে নিচ্ছি।”

আবদুল্লাহ শুধু একজন উদ্যোক্তা ছিল না, সে ছিল এক স্বপ্নের দালান তৈরির স্থপতি।খাবার বিক্রি করে শুরু করেছিল ব্যবসার পথচলা, পরে গাড়ির পার্টস বিক্রি করে চালিয়েছিল পুরো পরিবার।

যে বয়সে অনেকে জীবন শুরু করতে শেখে, সে বয়সে আবদুল্লাহ হয়ে উঠেছিল পরিবারের চালিকাশক্তি।এই ছেলেটিই আজ একটি অন্যায় রাষ্ট্রের নখরাঘাতে নিথর।তাঁর পিতা শুধু কান্নায় ভাঙেননি, তিনি তর্জনী তুলে বলেন, “গণভবন শহীদদের জাদুঘর হোক।”

এই দাবি শুধু আবেগ নয়,এ এক রাজনৈতিক সত্য, এক নৈতিক দায়।কারণ যদি আবদুল্লাহরা না দাঁড়াত, তাহলে আমরা আর এই কথাও বলতে পারতাম না,“বাংলাদেশ স্বাধীন।”

আজ আমরা যা কিছু বলতে পারি, লিখতে পারি, শ্লোগান দিতে পারি, তা তাদের রক্তে কেনা।

আর সেই রক্ত, যা ধোলাইঘাটের ছোট ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সোজা পৌঁছে গেছে গণভবনের মেঝেতে,তার দাগ এখনো শুকায়নি।

বাবা বলেন, “তোমরা ১৭ বছর কিছুই করতে পারোনি, আর এখন শহীদদের মূল্যায়নেও ব্যর্থ।”

এই কথার মধ্যে ইতিহাসকে জ্বালিয়ে দেওয়া অগ্নি আছে।রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে ছোড়া এই অভিযোগ শুধু হতাশা নয়, এটি এক আত্মবিক্রত সমাজের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা।কারণ আমরা কেউ আবদুল্লাহকে বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু সবাই মিলে তার রক্তকে ছিঁড়ে ফেলার ষড়যন্ত্রে নীরব সায় দিয়েছি।

এই পরিবার এখন নিঃসঙ্গ।চারদিকে লোকজন, ক্যামেরা, আলো, প্রশ্ন,কিন্তু ভিতরে নিখুঁত শূন্যতা।

রাতে তার মা হয়তো এখনো দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন।পায়ের শব্দ শুনলেই হয়তো ভাবে, “আবদুল্লাহ ফিরছে।” কিন্তু না, এখন আর সে ফিরে আসে না। শুধু আসে স্মৃতি, গন্ধহীন, রঙহীন, কাঁপা কাঁপা ছায়া হয়ে।

আর ইতিহাস ধীরে ধীরে লিখে নিচ্ছে তার নাম, এক শহীদের তালিকায়, এক দেশপ্রেমিকের আত্মজীবনীতে, এক বাবার বুকফাটা কান্নায়,যেখানে চোখের জলের সাথে মিশে আছে অগণিত নির্দোষ তরুণের রক্ত, আর একটি হারিয়ে যাওয়া বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা।

উত্তরাধিকার ও দাবিসমূহ

আবদুল্লাহর মৃত্যুতে যেমন একজন পিতা চুপচাপ ধুঁকে মরছেন প্রতিদিন, তেমনি একটি রাষ্ট্রও আজ কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছে অস্বীকারযোগ্য এক ঋণ।

এটা কোনো আবেগনির্ভর কান্না নয়, এটি এক নির্মম বাস্তবতা,যেখানে একজন নাগরিক রাষ্ট্রকে তার নৈতিক দেউলিয়াপনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখে চলে

গেছে।
আবদুল্লাহ দেশকে মুক্ত করে দিয়ে গেছেন,এই কথা প্রথমে শুনলে মনে হতে পারে বিপ্লবীদের আবেগঘন অতিশয়োক্তি।কিন্তু যদি ভালো করে শোনা যায়, রাস্তায় রাস্তায় যে শ্লোগান উঠেছিল, "স্বৈরাচার নিপাত যাক!", তার প্রতিটি ধ্বনিতে ছিল এই তরুণদের গলা।যারা কাঁধে ব্যানার নিয়েছিল, যারা লাঠি খেয়েও ফেরেনি,
যারা ভাইয়ের মতো একে অপরকে হাসপাতাল পৌঁছে দিয়েছিল,তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহর মতো স্বপ্নবান মানুষ।এই তরুণরাই বারুদের ঘ্রাণকে উপেক্ষা করে রাস্তায় ফুল ফোটানোর সাহস দেখিয়েছিল।
এখন রাষ্ট্রের সামনে তিনটি স্পষ্ট দায়িত্ব।
প্রথমত, আবদুল্লাহর পরিবারের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা ও তার ছোট বনের লেখা-পরার দায়িত্ব নেয়া
এমন এক পরিবার যারা একটি সন্তানের মাধ্যমে গোটা জাতিকে এক স্ফুলিঙ্গ দিয়েছে,তাদের পাশে না দাঁড়ানো মানেই ইতিহাসের বিরুদ্ধে যাওয়া।
দ্বিতীয়ত, তাঁদের ক্ষতিপূরণ নয়, পুনর্বাসন,পিতা যেন ব্যবসা আবার শুরু করতে পারেন, যেন ঘরে অন্ধকার না নামে।
তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং স্থায়ী স্মারক নির্মাণ।
আবদুল্লাহর পিতা যে দাবি তুলেছেন,"গণভবন হোক শহীদদের স্মৃতি জাদুঘর",তা কোনো প্রতিশোধ নয়।
এটা এক প্রতীকী শুদ্ধিকরণ, এক গণতান্ত্রিক শপথের পূর্ণতা, যেখানে ক্ষমতার আসন একদিন স্মৃতির মেঘদূত হয়ে দাঁড়াবে।
সেই জাদুঘরে থাকবে না কোনো স্বর্ণমুকুট, থাকবে শুধু খালি জুতা, ভাঙা ব্যানার, আর রক্তমাখা রুমাল,যেগুলো দিয়ে নতুন প্রজন্ম শিখবে কীভাবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়।
শহীদ আবদুল্লাহদের উত্তরাধিকার শুধু আইনগত নয়,এটা সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক।
আমাদের সংবিধানে যদি এই রক্তের দাম না লেখা থাকে, তাহলে সে সংবিধান আমাদের নয়।
তাঁর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশ, যেখানে ভয় থাকবে না, ভাত থাকবে, ভোট থাকবে, আর স্বপ্নপূরণের অধিকার থাকবে।
তাঁর রক্তে যে কবিতা লেখা হয়েছিল, সেই কবিতা এখন রাষ্ট্রকে মুখস্থ করতে হবে।
আমাদের করণীয় এখন একটাই,তাঁদের স্মৃতিকে রক্ষা নয়, বাঁচিয়ে রাখা আমাদের স্লোগানে, শিক্ষায়, গানে, সংবিধানে, এবং আমাদের প্রতিদিনের বিবেকের আয়নায়।
কারণ ইতিহাস বলেছিল, শহীদ মরে না।
এখন সময় এসেছে, রাষ্ট্র তা প্রমাণ করুক।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি
শহীদের পূর্ণনাম : আব্দুল্লাহ সিদ্দিক
জন্ম তারিখ/বয়স : বয়স ২৩ বছর
পেশা : ছাত্র, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, বিবিএ-মার্কেটিং ও উদ্যোক্তা, ধোলাইঘাটে গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবসা
পিতার নাম : আবু বক্কর সিদ্দিক
পিতার পেশা : অবসরপ্রাপ্ত
মাতার নাম : আবেদা সুলতানা
মাতার পেশা : গৃহিণী
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : পিতা ও ছোট বোন
স্থায়ী ঠিকানা : নাসিরুদ্দিন সরদার লেন, সদরঘাট, শুত্রাপুর, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : নাসিরুদ্দিন সরদার লেন, সদরঘাট, শুত্রাপুর, ঢাকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ (মার্কেটিং বিভাগ/বিবিএ)
ব্যবসা : ধোলাইঘাটে গাড়ির পার্টস
মাসিক আয় : প্রায় ৫০,০০০ টাকা
ঘটনার স্থান : পপুলার হাসপাতাল সংলগ্ন, ঝিগাতলা, ঢাকা
আঘাতকারী : আওয়ামী সন্ত্রাস ছাত্রলীগ বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ : ৪ আগস্ট, ২০২৪
শহীদের কবরের অবস্থান : রায়ের সাহেব বাজার পারিবারিক কবরস্থান